Vol. 58 | No. 1-2 | 2023

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন: সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াশীলতার অনুষঙ্গে ইতিহাসের পুনঃপাঠ

Volume	58
Issue	1-2
Year	2023
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Rafat Alam
Published online	February 1, 2023
DOI	10.62328/sp.v58i1-2.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v58i1-2.7
Pages	১৩৯-১৫৫
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন: সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াশীলতার অনুষঙ্গে ইতিহাসের পুনঃপাঠ

Check for updates

মো. রাফাত আলম মিশু

সাহিত্য পত্রিকা

Shahitto Potrika
eISSN 3006-886X
ISSN 0558-1583
Volume 58
Number 1-2

সাহিত্য পত্রিকা (২০২৩) ৫৮ (১-২): ১৩৯-১৫৫
DOI 10.62328/sp.v58i1-2.7

সাহিত্য পত্রিকা
বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন: সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াশীলতার অনুষঙ্গে ইতিহাসের পুনঃপাঠ

মো. রাফাত আলম মিশু*

সারসংক্ষেপ: রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের রাজনীতি ও ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের রয়েছে একটি ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত। ওই আন্দোলনের পরেও তার চেতনাগত তাৎপর্য বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। সময়ের পরিক্রমায় এবং জাতীয় রাজনীতির বিভিন্ন ধরনের পট-পরিবর্তনের ফলে একুশের চেতনা হয়েছে ক্রমরূপান্তরিত। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ইতিহাস এখন অনেকটা নির্দিষ্ট-কৃত। কিন্তু ইতিহাসের এত বড় একটি রাজনৈতিক আন্দোলন সংঘটিত হবার পেছনে থাকে বহুস্তরিক ও বহুমাত্রিক কারণ। সেই কারণ অনুসন্ধানে বর্তমানের আদর্শায়িত দৃষ্টিকোণের চেয়েও জরুরি উক্ত কালপর্বের বাস্তবতার পাঠ গ্রহণ; এর একটি দিক সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক অনুষঙ্গ। বর্তমান প্রবন্ধে বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রচলিত মূলধারার ইতিহাসের পাশাপাশি তৎকালীন বাস্তবতার অনুসন্ধানে ওই সময়ের রাজনীতি, অর্থনীতির সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক ক্রিয়াশীলতার অনুষঙ্গ ও জনমনস্তত্ত্বের কার্যকারণ সম্পর্ক উপস্থাপন করা হবে।

বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ইতিহাসে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন একটি দিকনির্ণায়ক ঘটনা। এ আন্দোলন ‘রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন’ নামে সর্বজন-পরিচিত ও স্বীকৃত। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি এ আন্দোলন তার চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে। ইতিহাসের ধারায় নানা ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ সালে যে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়, তার সঙ্গে জড়িত ছিল বাংলা জনাঞ্চলের জনমানুষের অনেক স্বপ্ন, প্রত্যাশা ও মুগ্ধতা। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পরে সেসবের মৃত্যু ঘটতে থাকে। মূলত অর্থনীতি-রাজনীতি-সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ে তৎকালীন পূর্ববাংলার জনমানুষের ওপর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর পৌনঃপুনিক শোষণনীতি, নিপীড়ন ও দমনপ্রক্রিয়ার বিপরীতে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের একটি দৃশ্যমান ও কার্যকর পরিণতির নাম ‘রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন’। এ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ১৯৪৭ থেকে শুরু হয়ে নানা পর্যায় অতিক্রম করে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি একটি সামূহিক রূপ লাভ করে। ‘রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন’ হয়ে ওঠে পূর্ববাংলার নিপীড়িত জনতার শোষণমুক্তির প্রতীক। ফলে এর প্রভাব বিরাজমান থাকে বায়ান্নর পরেও। এক অর্থে চেতনাগতভাবে বায়ান্নর পরেই একুশের

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

চেতনা বেশি ফলবান। একুশের এই প্রতিবাদী চেতনাকে সঙ্গে নিয়েই পাকিস্তান-পর্বের বাকি দুই দশকে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে। বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারিতে বাঙালির যে মন্ত্রবীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল তারই ফলবন্ত বৃক্ষ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা অর্জন। স্বাধীনতা-উত্তরকালেও একুশের চেতনা বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। রাষ্ট্রক্ষমতায় বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর উত্থান-পতনের সমান্তরালে একুশের তাৎপর্যও রূপান্তরিত হয়েছে। সেই অর্থে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন বা একুশের চেতনা বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক প্রেক্ষাপটে একটি অনিবার্য বিষয়।

সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছর পূর্তির মুহূর্তে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উজ্জীবনের কালে – একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক ঘোষিত হবার পর ২০০০ সাল থেকে একুশে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশই এ দিবস পালনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। মাতৃভাষা-চেতনা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তৎকালীন পূর্ববাংলায় যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির মধ্যে এ আন্দোলন গতিপ্রাপ্ত হয়ে ১৯৫২ সালে উত্তুঙ্গ পর্যায়ে পৌঁছেছিল, সেই পাঠটিও জরুরি। আমরা জানি – ১৯৫২ সালে স্বাধিকারের জন্য যে আন্দোলন ও সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছিল, তারই চূড়ান্ত পরিণতি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে একুশের চেতনার আবেদন লুপ্ত হয়ে যায়নি। বরং স্বাধীনতা লাভের মতো জাতির একটি বড় অর্জনের পর শাসকগোষ্ঠী একুশে ফেব্রুয়ারিকে কীভাবে গ্রহণ করেছে, সেই পাঠটিও স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক চারিত্র্য বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। একুশে ফেব্রুয়ারি বা ভাষা আন্দোলন-কেন্দ্রিক মূলধারার ইতিহাস বা জানা ইতিহাস বা প্রভাবশালী বয়ানের পাশাপাশি এ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক ক্রিয়াশীলতার কিছু বিবেচনা বর্তমান আলোচনার আওতাভুক্ত হবে।

১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান বাংলাদেশের জনমানুষের জন্য একটি বড় বাস্তবতা। পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পরপরই বাঙালি জনগণের সঙ্গে শাসকগোষ্ঠী যে বিরোধমূলক আচরণ প্রকাশ করে তার প্রথম প্রকাশ ঘটে রাষ্ট্রভাষাকে কেন্দ্র করে। কিন্তু আভ্যন্তর কার্যকারণ অনুসন্ধানে দেখা যায় এ বিরোধমূলক সম্পর্ক কেবল ভাষাকেন্দ্রিক ছিল না। বরং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য, শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে জনমানুষের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের প্রকাশ দেখা যায় রাষ্ট্রভাষাকে কেন্দ্র করে। রাষ্ট্রভাষার বিষয়ে যে আলোচনা শুরু হয়, তা ছিল প্রথমত তাত্ত্বিক পর্যায়ে এবং তা কিছুসংখ্যক শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৪৮ সালে তা ছাত্র-জনতার মধ্যে সম্প্রসারিত হয়। সেই পরিসরটিও ব্যাপক ছিল না।

পরবর্তীকালে ১৯৫১ সালে ও ১৯৫২ সালের প্রথমার্ধে তা ব্যাপক রূপ লাভ করে। কেন ১৯৪৮ সালে তা জনমানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগাতে পারেনি এবং কেন দুই বছরের মধ্যে তা সর্বব্যাপ্ত রূপ লাভ করে, তা-ও অনুসন্ধান করার বিষয়। এর জন্য জেনে নেওয়া দরকার ১৯৪৭-পরবর্তী পাকিস্তানভুক্ত পূর্ববাংলার বাঙালির মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে। ২০২৩ সালে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশে বাঙালি জাতীয়তাবাদের অনুকূল পরিবেশে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কালকে যেভাবে দেখতে অভ্যস্ত; ওই কালের বাস্তবতা তেমনটা ছিল না। এবং অপরাপর যে-কোনো সমাজব্যবস্থার মতো তখনকার সামাজিক ও শ্রেণিগত অবস্থাও ছিল না সরলীকৃত। প্রকৃত বাস্তবতা অনুধাবনের জন্য ওই কালপর্বের প্রত্যক্ষদর্শী লেখক, কর্মী ও রাজনীতিবিদদের বক্তব্যের দ্বারস্থ হতে হয়। ১৯৫২, ১৯৬৯ এবং ১৯৭১-এর মতো ১৯৪৭ ও বাঙালির জন্য দিকনির্ণায়ক বিন্দু। ১৯৪৭ সালের পূর্বে প্রায় পুরো চল্লিশের দশক জুড়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বাঙালি মুসলমানের অংশগ্রহণের পেছনে ছিল একটি ঐতিহাসিক পরম্পরা। ১৯৪৭ সালের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া, দেশভাগ ও দেশহারানোর বাস্তবতা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন আছে। কিন্তু বাংলাদেশের বাঙালিদের একটি বড় অংশ বিশেষত শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান অংশ পাকিস্তান চেয়েছিল এবং তার জন্য গড়ে তুলেছিল কার্যকর আন্দোলন, তা ঐতিহাসিক সত্য। এ-প্রসঙ্গে ভাষাসৈনিক আহমদ রফিক (জ. ১৯২৯) তাঁর *দেশবিভাগ: ফিরে দেখা* গ্রন্থের 'আমজনতারও স্বপ্ন ছিল পাকিস্তান' পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন:

> বঙ্গদেশে চল্লিশের দশকে রাজনীতির খেলা, লীগ-কংগ্রেসের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব আর মোহাম্মদ আলী জিন্নার তথাকথিত দ্বিজাতিতত্ত্বের বাহারি পাকিস্তানি বেলুন যা দেখে মুগ্ধ বাঙালি মুসলমান। এ মুগ্ধতার পেছনে ছিল বিরাজমান আর্থ-সামাজিক বৈষম্য থেকে মুক্তির স্বপ্ন। মুক্তি অর্থনৈতিক সচ্ছলতার জন্য, সচ্ছলতা না হোক অন্ততপক্ষে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের। (২০১৫: ১৭)

অর্থাৎ এ স্বপ্ন ছিল শোষণমুক্তির স্বপ্ন। ব্রিটিশ সরকারের বিদায়, বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, ধনী-গরিবের বৈষম্য হ্রাস, ন্যায়ভিত্তিক শোষণহীন সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যেই এদেশের মানুষ 'পাকিস্তান-আন্দোলন'কে সমর্থন জানিয়েছিল। এ দেশের মানুষই ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগকে বিপুল ভোটে বিজয়ী করে সেই সমর্থনের একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৭-পরবর্তী বাস্তবতা মূলত শোষণমুক্তির বদলে শোষণের পরম্পরার বাস্তবতাতে পরিণত হয়। উন্মোচিত হতে থাকে সামন্ততান্ত্রিক ও ধর্মতান্ত্রিক পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর প্রতারক চারিত্র্য। প্রতারিত হয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অন্যতম অংশীজন বাঙালি মুসলমান। এ-প্রসঙ্গে বাংলাদেশের অন্যতম সমাজ-রাষ্ট্রচিন্তক আবুল কাসেম ফজলুল হক (জ. ১৯৪৪) বলেন:

> এক শোষকের বদলে নতুন আর এক শোষককে – এক অত্যাচারীর বদলে নতুন আর এক অত্যাচারীকে তারা ক্ষমতায় বসাচ্ছে – একথা তখন তারা ভাবতেও পারেনি। অন্যায়মুক্ত, অভাবমুক্ত, প্রেম-প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যপূর্ণ নতুন জীবনের স্বপ্নই তাদেরকে একদা পাকিস্তান আন্দোলনে আকৃষ্ট করেছিল। (১৯৯৮: ১৯)

ফলে রাজনীতির ক্ষেত্রেও দৃশ্যমান পরিবর্তন ঘটতে থাকে। মুসলিম লীগ নেতৃত্ব আজন্ম সামন্তশ্রেণিনিয়ন্ত্রিত। পাকিস্তান সৃষ্টিতে নেতৃত্বদানকালে চল্লিশের দশকে দৃশ্যমান হতে থাকে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের প্রধান দুই অংশ। এক পক্ষে দেখা যায় সামন্ত ও ধর্মীয় মূল্যবোধতাড়িত শ্রেণি, যাদের নেতৃত্বে ছিল ঢাকার আহসানমঞ্জিল কেন্দ্রিক নবাব-পরিবার। অন্য পক্ষে উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণি, যাদের মধ্যে উদারনৈতিক বুর্জোয়া মানসিকতা লক্ষ করা যায়। কিন্তু দেশভাগের ফলে ঢাকা প্রাদেশিক রাজধানী হলে নবাব পরিবার অগণতান্ত্রিক আচরণের মাধ্যমে অপর অংশকে কোণঠাসা করে রাখতে চায়। ভাষা ও জাতিগতভাবেও তারা নিজেদের বাঙালি মনে করত না, যতটা মুসলমান মনে করত। ফলে নিজ জনাঞ্চলের স্বার্থ, সুযোগ-সুবিধা দেখার চেয়ে ব্যক্তিস্বার্থে তারা পাকিস্তানের শাসকদের স্বার্থেই নিজেদের নিয়োজিত রাখে। আর স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম লীগের অপর অংশ যারা জন্মগত, ভাষাগত ও সংস্কৃতিগতভাবে বাঙালি; তাদের সঙ্গে রক্ষণশীল অংশের বিরোধ শুরু হয়। কিন্তু বাঙালি মনস্তত্ত্বে তখনও পাকিস্তানের প্রতি ছিল গভীর দুর্বলতা। ধর্মের ভিত্তিতে প্রত্যাশিত পাকিস্তানে ধর্মীয় প্রভাবও জনমনস্তত্ত্বে দৃঢ়ভাবে বিরাজমান ছিল। এবং পাকিস্তানের 'জাতির পিতা' বলে খ্যাত 'কায়েদে আজম'-ভূষিত মুহম্মদ আলি জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৮) বাঙালি জনগণের কাছে তখন পর্যন্ত জীবন্ত কিংবদন্তি, এক অলঙ্ঘনীয় ব্যক্তিত্ব। একদিকে বাস্তবের শোষণমূলক অবস্থা এবং অন্যদিকে পাকিস্তানপ্রীতির মনস্তত্ত্ব বাঙালি মুসলমানকে এক দ্বৈরথ অবস্থার মধ্যে পতিত করে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নয়, ইসলামের বিরুদ্ধে নয়, জিন্নার বিরুদ্ধে নয়; বরং এগুলোকে স্বীকার করে নিয়েই শোষণমুক্তির নতুন অভিযাত্রায় অভিযাত্রী হয় ১৯৪৭-এর 'পাকিস্তানি বাঙালি' জনগোষ্ঠী। রাজনৈতিক তৎপরতা, নতুন দল গঠন, নতুন সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা, সাহিত্যচর্চা সব ক্ষেত্রেই এ বাস্তবতা পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমেই উক্ত সময়পর্বে রাজনৈতিক তৎপরতার কয়েকটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যায়। ১৯৪৭ সালের ৬ এবং ৭ সেপ্টেম্বর গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ। এ সংগঠনের সক্রিয়দের একাংশ ছিলেন ছিলেন সাম্যবাদী চিন্তায় অনুপ্রাণিত। একসময়ের মুসলিম লীগ কর্মীরাই এ দল গঠন করেছিলেন। শামসুল হক (১৯১৮-১৯৬৫) (সভাপতি), কামরুদ্দীন আহমদ (১৯১২-১৯৮২), মোঃ তোয়াহা (১৯২২-১৯৮৭), তাজউদ্দীন আহমদ (১৯২৫-১৯৭৫), অলি আহাদ (১৯২৮-২০১২) প্রমুখ ছিলেন গণতান্ত্রিক যুবলীগের নেতৃস্থানীয় কর্মী। (বদরুদ্দীন, ২০১২ [১ম]: ২২) নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থায় সাম্যবাদী আদর্শকে ধারণ করেই এ দল গঠিত হয়েছিল। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে এ সংগঠনটি নেতৃত্বসূচক ভূমিকা পালন করেছিল।

কিন্তু সরকারি দমননীতির কারণে এ দল বেশি দিন টিকে থাকতে পারেনি। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন এক সম্মেলনে 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠিত হয়: সভাপতি – মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (১৮৮৫-১৯৭৬), সাধারণ সম্পাদক – শামসুল হক, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক – শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) ও খন্দকার মোশতাক আহমদ (১৯২০-১৯৯৬)। এ রাজনৈতিক দল পরবর্তীকালে বাংলাদেশের বড় রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়, যার বর্তমান নাম 'বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ'। এ রাজনৈতিক দল গঠন ছিল প্রধানত মুসলিম লীগের জনবিচ্ছিন্নতা ও অগণতান্ত্রিক আচরণের ফল হিসেবে। কিন্তু এখানেও লক্ষ করবার বিষয় – প্রাথমিক পর্বে আওয়ামী মুসলিম লীগও পাকিস্তানি আদর্শকে ধারণ করেই তার যাত্রা শুরু করেছিল। প্রতিষ্ঠার পরদিন (২৪ জুন) আরমানিটোলায় অনুষ্ঠিত জনসভায় দলের লক্ষ্য সম্পর্কে যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল তাতে 'প্রস্তাবনায় পৃথিবীর এই অঞ্চলে কমুনিজমের প্রসার রোধ করার জন্য পাকিস্তানকে দারুল ইসলাম বা সত্যিকার মুসলিম রাষ্ট্ররূপে গড়ে তোলার অঙ্গীকার করা হয়।'[১] (সাঈদ-উর, ২০০১: ১৭) রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে এ দলটির অনেক কর্মী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল।

রাজনৈতিক দল ছাড়াও ওই সময়ে গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন। পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস (১৯৪৭), সংস্কৃতি সংসদ (১৯৫১), পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ (১৯৫২) প্রভৃতির যে ভূমিকা, তাতে পাকিস্তানের সমুন্নতি রক্ষা, ইসলামি মূল্যবোধের জাগরণ, অখণ্ড বাঙালি চেতনার পরিবর্তে মুসলিম বাঙালির ধারণা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা দেখা যায়। এমনকি সাংগঠনিকভাবে যে তমদ্দুন মজলিস রাষ্ট্রভাষা-প্রশ্নে প্রথম সক্রিয় অবস্থান গ্রহণ করে, তারও আদর্শগত প্রত্যাশা ছিল 'ইসলামী নিয়ম-কানুনের ভিত্তিতে পরিচালিত পাকিস্তান।' (সাঈদ-উর, ২০০১: ২৬) আবার, সাহিত্য ক্ষেত্রেও বাংলা ভাষায় 'আরবি-ফারসি শব্দে'র বহুল ব্যবহারের মাধ্যমে 'হিন্দু বাংলা' থেকে 'মুসলমান বাংলা'কে আলাদা করার তৎপরতা যা চল্লিশের দশকের শুরু থেকেই ছিল সক্রিয়, তা আরও বেগবান হয়। যেমন প্রাবন্ধিক মোহাম্মদ আবদুল হক ১৯৪৪ সালে মাসিক *মোহাম্মদী* পত্রিকায় 'সাহিত্যে সৃষ্টির প্রেরণা' প্রবন্ধে লেখেন: 'বাংলা সাহিত্য জাতীয় সাহিত্য নয়, হিন্দু সাহিত্য।... মুসলমানের সাহিত্য মুসলমানকেই রচনা করিতে হইবে।' (উদ্ধৃত, হুমায়ুন, ২০১৪: ১৮) সাংগঠনিকভাবে এ তৎপরতায় ১৯৪০ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁস সোসাইটি ও ১৯৪২ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। লক্ষ করবার বিষয়, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হওয়ার অনেক আগে থেকেই, কেবল লাহোর প্রস্তাবের কারণে, এ তৎপরতা শুরু হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁস সোসাইটির লক্ষ্য ছিল: 'জাতীয় রেনেসাঁর উদ্বোধক পাকিস্তানবাদের সাহিত্যিক রূপায়ণ, পাকিস্তানবাদ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ও মননমূলক আলোচনার ব্যবস্থা করা, সাহিত্যে পাকিস্তানবাদবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারাকে

প্রতিহত করা।' (সাঈদ-উর, ২০০১: ২৫) এমন চিন্তাধারার সঙ্গে ওইকালের সাহিত্য-সংশ্লিষ্ট প্রায় সকল শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান একমত পোষণ করেছিলেন। এ তালিকায় কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১), আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯), ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪), মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯) প্রমুখ অগ্রভাগে থাকবেন। যেমন, ১৯৪২ সালে আবুল মনসুর আহমদ তাঁর 'সাহিত্যে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য' প্রবন্ধে বলেন: 'রাজনীতিতে পাকিস্তান সম্ভব-অসম্ভব ও আবশ্যক-অনাবশ্যক দুই-ই হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যে পাকিস্তান শুধু সম্ভব নয় – স্বাভাবিক এবং দরকারী।' (আবুল মনসুর, ১৩৪৯) বাঙালি মুসলমানদের যে-ভাষায় সাহিত্য চর্চা করা উচিত, তিনি তার স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে বলেন: 'সেটা হবে বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা – হিন্দুর মাতৃভাষা নয়।' (আবুল মনসুর, ১৩৪৯) স্পষ্টতই এখানে সম্ভাব্য পাকিস্তানের ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটি স্বাতন্ত্র্যমূলক পরিচয় নির্ধারণের প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পরে 'এ-সময়ের কবিদের অধিকাংশই রচনা করেছেন পাকিস্তান, কায়েদে আজম, কায়েদে মিল্লাত ও শায়েরে পাকিস্তান বা ইকবালের স্তোত্র, ঈদের ও আজাদীর মহিমা বর্ণনা করেছেন তাঁরা বছরের পর বছর; এবং প্রকাশ করেছেন শিল্পগুণহীন আবেগ-উচ্ছ্বাস-উল্লাস-ক্ষোভ।' (হুমায়ুন, ২০১৪: ২৮) এমন পাকিস্তানবাদের ভরামৌসুমে বিদ্বৎ-মহলে উত্থাপিত হয় রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গ। ১৯৪৭ সালের ১৭ মে মুসলিম লীগ নেতা চৌধুরী খলিকুজ্জামান (১৮৮৯-১৯৭৩) উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র জাতীয় ভাষা করার প্রস্তাব করলে বাঙালি বুদ্ধিজীবীমহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। লেখক-প্রাবন্ধিক আবদুল হক দুই দফায় লেখেন 'বাংলা ভাষাবিষয়ক প্রস্তাব' শীর্ষক প্রবন্ধ (*ইত্তেহাদ* ২২ ও ২৯ জুন ১৯৪৭) এবং পরবর্তীকালে 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধ (দৈনিক *আজাদ* ৩০ জুন ১৯৪৭)। একই বছর জুলাই মাসে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জিয়াউদ্দিন আহমদ (১৮৭৩-১৯৪৭) উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে মত দেন। তখন প্রতিষ্ঠানিকভাবে এ বক্তব্যের কোনো প্রতিবাদ হয়নি। কিন্তু মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫-১৯৬৯) লিখিতভাবে জিয়াউদ্দিনের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। দৈনিক *আজাদ* পত্রিকায় ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের ১২ শ্রাবণ তারিখে 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে এ প্রবন্ধ 'আমাদের ভাষা সমস্যা' নামে পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি বলেন:

> কংগ্রেসের নির্দিষ্ট হিন্দীর অনুকরণে উর্দু পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষারূপে গণ্য হইলে তাহা শুধু পশ্চাদগমনই হইবে।... ইংরেজী ভাষার বিরুদ্ধে একমাত্র যুক্তি এই যে, ইহা পাকিস্তান ডোমিনিয়নের কোনও প্রদেশের অধিবাসীরই মাতৃভাষা নয়। উর্দুর বিপক্ষেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। পাকিস্তান ডোমিনিয়নের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মাতৃভাষা বিভিন্ন, যেমন – পুষ্‌তু, বেলুচী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী এবং বাংলা; কিন্তু উর্দু পাকিস্তানের কোনও অঞ্চলেই মাতৃভাষারূপে চালু নয়।... যদি বিদেশী ভাষা বলিয়া ইংরেজী পরিত্যক্ত হয়, তবে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ না করার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। যদি

> বাংলা ভাষার অতিরিক্ত কোন রাষ্ট্রভাষা গ্রহণ করতে হয়, তবে উর্দু ভাষার দাবী বিবেচনা করা কর্তব্য। (উদ্ধৃত, বদরুদ্দীন, ২০১২ [১ম]: ১৯-২০)

এ প্রবন্ধেরই আরেক অংশে তিনি আরবিকে মুসলমানের জাতীয় ভাষা হিসেবে উল্লেখ করেন। সেই হিসেবে তিনি মনে করেন আরবি ভাষাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। (বদরুদ্দীন, ২০১২ [১ম]: ১৯-২০) আবুল মনসুর আহমদও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার পক্ষেই সোচ্চার ছিলেন। তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন: 'পাকিস্তান হওয়ার পর ঢাকার শিক্ষক-ছাত্র, যুবক-তরুণরা মিলিয়া তমদ্দুন মজলিসের পক্ষ হইতে রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে যে পুস্তিকা বাহির করেন, তাতে অন্যান্যের সাথে আমারও একটা লেখা ছিল। তাতে বাংলাকে সরকারী ভাষা করার দাবি করা হইয়াছিল।' (২০১৬: ২৪৯)

লক্ষ করবার বিষয় – যাঁরা সাহিত্যিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে ছিলেন পাকিস্তানি আদর্শের অনুসারী, তাঁদের অনেকেই উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার বিপক্ষে এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে সক্রিয় অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৪৭-১৯৪৮ সালে যাঁরা যুগপৎ পাকিস্তানি আদর্শ রক্ষা ও রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সক্রিয় অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন, তাদের মানসপ্রবণতা বোঝার জন্য আহমদ শরীফের (১৯২১-১৯৯৯) এই বক্তব্যটি এখানে উল্লেখ করা যায়:

> যাঁরা বাঙলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে পেতে চেয়েছেন, বাঙলা ভাষার ভাবী রূপ-স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁদের মত ও মতলব অভিন্ন ছিল না। ব্রিটিশ আমলে কোলকাতায় চালু লিখিত সাধু কিংবা চলিত রীতির ভাষা অবিকৃতভাবে অনুসরণের পক্ষে যেন খুব কম পাকিস্তানীই ছিলেন। তখন পাকিস্তানী ও ইসলামী জোশ এত প্রবল যে, ভিন্নমতের স্থিতধী বুদ্ধিজীবীরা মুখ খুলতে শঙ্কা-সংকোচ বোধ করেছেন। (২০১১: ১৬-১৭)

আহমদ শরীফ এ কথা বলছেন স্বাধীন বাংলাদেশে, আশির দশকে, যখন বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিশেষ অবস্থা বিরাজমান – ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সামরিক শাসক। সেই সময় বাঙালি জাতীয়তাবাদের চর্চা একটি প্রতিবাদী অবস্থান হিসেবে বিবেচিত। তাই এ বক্তব্যের মধ্যে সেই জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ লক্ষ করা যায়। কিন্তু পাকিস্তানসৃষ্টি-পরবর্তী বাস্তবতায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজন থেকে রাষ্ট্রভাষা বাংলাকে পাকিস্তানি আদর্শের পরিসরেই তাঁরা অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচনা করেছিলেন। চিরায়ত বাংলা, বা অখণ্ড বাংলা বা 'হিন্দু-মুসলমানের সমন্বিত বাংলা'র কথা ভেবে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার বিষয়টি উত্থাপিত হয়নি। সেই 'হিন্দুয়ানি থেকে স্বতন্ত্র' বাংলাকেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে তাঁরা দেখতে চেয়েছেন। বর্তমানকালে যে আবেগ দিয়ে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন বা পরিবর্তিত বাস্তবতায় মাতৃভাষা চেতনাকে বিবেচনা করা হয়, তৎকালীন বাস্তবতা সেই কথা বলে না ।

তৎকালীন বাস্তবতা বোঝার জন্য আরও কয়েকটি ঘটনার প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই সদ্য প্রকাশিত সরকারি এনভেলাপ, পোস্টকার্ড, মনি অর্ডার, ডাকটিকিট রেলটিকিট ইত্যাদিতে উর্দু এবং ইংরেজি থাকলেও বাংলা ছিল অনুপস্থিত। (আহমদ, ২০১৫ [ভাষা]: ২০১৬) ফলে বাঙালি শিক্ষিত শ্রেণি এই বিষয় ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। এটি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর একদেশদর্শী নীতির বহিঃপ্রকাশ। অথচ এ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে বাঙালি মুসলমানের ভূমিকা কোনো অংশে কম নয়। যদিও ভাষা-প্রসঙ্গ দিয়েই বৈষম্যের দৃশ্যমান সূত্রপাত, কিন্তু এ বৈষম্যমূলক আচরণ কেবল ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ১৯৪৭-এর নভেম্বর মাসে বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে ঢাকার নীলক্ষেত ব্যারাকে বসবাসরত সরকারি কর্মচারীদের একটি বিশাল অংশ ব্যারাক প্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে মিছিল সমাবেশ করে। এক হিসেবে এটিই ছিল ভাষা-প্রসঙ্গে প্রথম কোনো প্রতিবাদ-সমাবেশ। সরকারি কর্মচারীরা সাধারণত আবেগচালিত হয় না; আসন্ন অস্তিত্ব-সংকট মোকাবিলার একটি দৃশ্যমান রূপ হিসেবে ওই মিছিল-সমাবেশকে বিবেচনা করা যায়। ২৭ নভেম্বর ১৯৪৭ তারিখে করাচির শিক্ষা-সম্মেলনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর পক্ষে সুপারিশ গৃহীত হলে ঢাকায় তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয়। সেখানে কেবল ছাত্ররাই নয়, নীলক্ষেত ও পলাশি ব্যারাকের সরকারি কর্মচারীরাও অংশগ্রহণ করে এবং তৎকালীন প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের (১৮৯৪-১৯৬৪) সরকারি বাসভবন বর্ধমান হাউসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। (আহমদ, ২০১৫ [ভাষা]: ১৬) সরকারি কর্মচারীদের বঞ্চনার ক্ষোভই এখানে প্রধান। এর কয়েকমাস আগে অর্থাৎ পহেলা সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ তারিখে গঠিত হয় তমদ্দুন মজলিস; এর প্রধান সংগঠক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক মোহাম্মদ আবুল কাসেম (১৯২০-১৯৯১)। সেই সংগঠন ১৫ সেপ্টেম্বর *পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষা বাংলা – না উর্দু* পুস্তিকা প্রকাশ করে। সেখানে আবুল মনসুর আহমদের 'বাংলাই আমাদের রাষ্ট্র-ভাষা হইবে' শীর্ষক যে লেখাটি অন্তর্ভুক্ত ছিল তাতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার সঙ্গে সাধারণ বাঙালির সম্পর্কটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে:

> উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করিলে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত সমাজ রাতারাতি "অশিক্ষিত" ও সরকারী চাকরির "অযোগ্য" বনিয়া যাইবেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফারসীর জায়গায় ইংরেজীকে রাষ্ট্রভাষা করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম শিক্ষিত সমাজকে রাতারাতি "অশিক্ষিত" ও সরকারী কাজে "অযোগ্য" করিয়াছিলেন। (১৯৪৭: সতের)

১৯৪৭ সালের ৩০শে জুন তারিখে দৈনিক *আজাদ* প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে আবদুল হকও প্রায় একই ধরনের শঙ্কা ব্যক্ত করেছিলেন। বলেছিলেন: 'উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে পূর্ব পাকিস্তানের পাঁচ কোটি লোক সরকারী চাকুরীর অনুপযুক্ত হয়ে পড়বে। এবং আমাদের সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নতি শুধু ব্যাহত হবে না, রুদ্ধ হয়ে যাবে।' (১৯৭৬: ১৫-১৬) অর্থাৎ তৎকালীন বাস্তবতায় রাষ্ট্রভাষার এই প্রসঙ্গটি যতটা ছিল সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক, তার চেয়ে বেশি ছিল অর্থনৈতিক। কারণ মানুষ ভাষা ব্যবহার করে যে

সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা করে, তার পরিসর খুবই সীমিত। বরং ভাষা মানুষের জীবন-জীবিকা, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরিপ্রাপ্তি ইত্যাদির সঙ্গে বেশি সম্পর্কযুক্ত। তাই তৎকালে আন্দোলনের গতির হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে এ অর্থনৈতিক বোঝাপড়াটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের গণপরিষদের অধিবেশনে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮৬- ১৯৭১) ইংরেজি ও উর্দুর সঙ্গে বাংলাকে গণপরিষদের ব্যবহারিক ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু বাঙালি-অবাঙালি উভয় শ্রেণির মুসলিম লীগ সদস্যদের বিরোধিতায় ওই প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। এর ফলে ঢাকায় আন্দোলন আরও বেগবান হয়। ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকার সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। ২৮ ফেব্রুয়ারি এক সভা থেকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় – ১১ মার্চ দেশব্যাপী প্রতিবাদ সমাবেশ পালন করা হবে। এ বৈঠকের উদ্যোগ নেয় তমদ্দুন মজলিস ও পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ। ২ মার্চ গঠিত হয় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'; আহ্বায়ক হন তমুদ্দন মজলিসের সদস্য শামসুল হক। ১১ মার্চের কর্মসূচিকে সফল করতে বিভিন্ন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এদিকে পাকিস্তান সৃষ্টির পর পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মুহম্মদ আলি জিন্নাহর প্রথমবারের মতো ঢাকায় আগমনের (১৯ মার্চ) কর্মসূচি ঠিক করা ছিল। ফলে এ আন্দোলন প্রতিরোধ ও জিন্নার আগমন উপলক্ষ্যে ঢাকার পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ রাখা প্রাদেশিক সরকারের জন্য বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। ১১ মার্চ সচিবালয়, নীলক্ষেত ও পলাশি ব্যারাক, রেলওয়ে ওয়ার্কশপ ইত্যাদি জায়গায় পিকেটিং হয় এবং পুলিশ ও সরকার সমর্থক গোষ্ঠীর আক্রমণে অনেক আন্দোলনকারী আহত হয়। অনেক নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয় । এ আন্দোলন ঢাকার বাইরে রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা, যশোর, খুলনা, ময়মনসিংহ, জামালপুর, ভৈরব, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়ে। (আহমদ, ২০১৫ : ২০) পরিস্থিতি সামলে নিতে সরকার আন্দোলনকারীদের কিছু দাবি মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শান্তিচুক্তির আহ্বান জানায়। ১৫ মার্চ আটদফার শান্তিচুক্তি[২] স্বাক্ষরিত হয়, তার মধ্যে অন্যতম ছিল পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠা। ১১ মার্চ গ্রেফতারকৃত অন্যদের সঙ্গে তরুণ নেতা শেখ মুজিবকে ১৫ তারিখ সন্ধ্যায় মুক্তি দেওয়া হয়। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* থেকে জানা যায় – ১৬ মার্চ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত আমতলায় তাঁর সভাপতিত্বে যে ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয় সেখানেও সংগ্রাম পরিষদের সাথে সরকার যেসব শর্তের ভিত্তিতে আপস করেছে তার সবগুলো অনুমোদন করা হয়। (শেখ মুজিবুর, ২০১৪ : ৯৬) অবশ্য এ চুক্তি সকল ছাত্র-জনতা মেনে নিতে পারেনি। (তাজউদ্দীন, ২০২২ : ১৭৮) এ চুক্তির মাধ্যমে সংগ্রাম পরিষদের আন্দোলন এক অর্থে স্থগিত হয়ে যায়। কিন্তু কেন এই আপসরফা? ভাষাসৈনিক আহমদ রফিক জানাচ্ছেন:

> এর আপাত-কারণ পাকিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঢাকা সফর এবং সেই সূত্রে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সংগ্রাম পরিষদের সম্পাদিত চুক্তি। কিন্তু এর নেপথ্যে রয়েছে সংগ্রাম পরিষদের নানা মতাদর্শভিত্তিক নেতৃত্বে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং সংগঠন বিশেষের

> পিছুটান।... ছাত্রদের বড়সড় অংশ এবং জনসাধারণের মধ্যে অন্ধ পাকিস্তানপ্রীতি তখনো প্রবল। বিরাজমান সাম্প্রদায়িক চেতনা এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহতা তার প্রমাণ । (২০১৫ [ভাষা]: ২৯)

অর্থাৎ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে পাকিস্তান-প্রীতি, জিন্না-প্রীতি, ধর্মীয় চেতনা এসব নিয়েই গঠিত ছিল তৎকালীন বাঙালি মুসলমানের মন। কিন্তু তারপরেও যে আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে তা এ জনগোষ্ঠীর মাধ্যমেই হয়েছে। ২১ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে জনসভায় জিন্না যে বক্তৃতা করেছিলেন এবং বলেছিলেন – 'কেবল উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা', তা নিয়ে যে চালু কথা প্রচলিত আছে প্রত্যক্ষদর্শী অনেকেই ভিন্ন কথা জানান। যেমন, ওই সময়ের তরুণ রাজনৈতিক কর্মী পরবর্তীকালে বিশিষ্ট লেখক ও দার্শনিক সরদার ফজলুল করিম (১৯২৫-২০১৪) স্মৃতিচারণায় জানান: 'আমি একজন সচেতন কর্মী হিসেবেই সেখানে গিয়েছিলাম ... সেখানে কোনো বিক্ষোভ বা প্রতিবাদ আমি লক্ষ করিনি।' (উদ্ধৃত, আহমদ, ২০১৫ [ভাষা]: ২৩) অর্থাৎ জিন্নার কথায় মর্মাহত হলেও তাকে অতিক্রম করতে পারেনি ছাত্ররা[৩]। তবে ২৪ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কার্জন হলে ইংরেজি ভাষায় জিন্না যে বক্তৃতা করেছিলেন সেখানে কিছুসংখ্যক ছাত্র প্রতিবাদ জানিয়ে প্রগতিশীল স্রোতের জানান দিয়েছিল।

ভাষাকেন্দ্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের এ পর্যায়ে এক ধরনের বিরতি আসে। কিন্তু আন্দোলন থেমে থাকেনি। 'যদিও বৃহত্তর জনসমাজ ১৯৪৮ সালের ভাষা-আন্দোলনে তেমন করে সাড়া দেয়নি, তবু পরের বছর থেকে ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা-দিবসরূপে পালিত হতে থাকে।' (আনিসুজ্জামান, ২০১৫ : ১৭০) নতুন নতুন রাজনৈতিক দল গঠন, বিভিন্ন সাহিত্য সম্মেলনে বাংলা ভাষার পক্ষে অবস্থান, দেশের বিভিন্ন অংশে কৃষকদের সংগ্রাম তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী ও জনসাধারণের মধ্যে দূরত্বকে নির্দেশ করে। নানামুখী ষড়যন্ত্রের বিপরীতে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে প্রতিবাদও অব্যাহত থাকে। ১৯৪৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর ও পহেলা জানুয়ারি ১৯৪৯ এই দুই দিন ঢাকার কার্জন হলে তৎকালীন প্রাদেশিক স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাবীবুল্লাহ বাহারের (১৯০৬-১৯৬৬) উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য-সম্মেলন'। এ অনুষ্ঠানের মূল সভাপতি ছিলেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। সভাপতির ভাষণে শহীদুল্লাহ্ বাংলা ভাষার সঙ্গে বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনার সংযোগসূত্রের প্রকৃত সত্যটি উন্মোচন করেন। তিনি বলেন:

> আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙ্গালী। এটি কোনো আদর্শের কথা নয়। এটি একটা বাস্তব কথা। মা-প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙ্গালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছে যে, মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জোটি নেই। (উদ্ধৃত, সাঈদ-উর, ২০০১: ৩৫)

১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের রাজধানী করাচিতে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান শিক্ষক সম্মেলনে পাকিস্তান সরকারের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী, যিনি পূর্ববাংলারই লোক (দোহার, ঢাকা), ফজলুর রহমান (১৯০৫-১৯৬৬) 'ইসলামি আদর্শের খাতিরে' বাংলা ভাষার জন্য 'আরবি হরফ' (প্রকারান্তরে উর্দু হরফ) গ্রহণের প্রস্তাব করেন। ১৯৪৯ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি পেশাওয়ারে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান সরকারের কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের সভায় আরবি হরফকে পাকিস্তানের একমাত্র হরফ করার জন্য সুপারিশ করা হয়। বাংলা ভাষায় আরবি হরফ প্রচলনের দায়িত্ব প্রদান করে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌কে পত্র দেওয়া হয়। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ওই প্রস্তাবে কোনো সাড়া দেননি। (রফিকুল, ২০১৮: ১৫১)

এরপর ১৯৫১ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন নতুন রূপে অধিক শক্তি নিয়ে ফিরে আসে। ১৯৪৮ সালের আন্দোলনকে স্মরণ করে ১৯৫১ সালে ১১ মার্চ উদ্‌যাপন করা হয়। কিন্তু এই তিন বছরের মধ্যে কী ধরনের ঘটনা বা পরিবর্তন ঘটেছিল, যার কারণে এই আন্দোলন নবরূপে ফিরে আসে? ভাষা আন্দোলনের ওপর প্রণিধানযোগ্য গবেষণাগ্রন্থ বদরুদ্দীন উমরের (জ. ১৯৩১) *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* (প্রথম প্রকাশ: ১৯৭০) থেকে জানা যায় – ১৯৪৮ সাল থেকেই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়, সরকারের কর্ডন নীতি, লেভি ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়। ফলে দুর্ভিক্ষ-অবস্থার সৃষ্টি হয়। '১৯৪৮-৪৯ সালে পূর্ব বাঙলায় যে ব্যাপক খাদ্য সংকট ও দুর্ভিক্ষাবস্থা দেখা গেল সেই অবস্থাকে প্রতিরোধ করার কোন সুসংগঠিত ব্যবস্থা হয়নি।... ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে পূর্ব বাঙলায় লবণ সংকট একটা চরম আকার ধারণ করে। এই সংকটকালে লবণের দর ক্রমাগত ওপরের দিকে ওঠা শুরু করে শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় সের প্রতি ১৬ টাকায়!' (বদরুদ্দীন, ২০১২ [২য়]: ৬২) এছাড়াও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে ভারত থেকে আগত মুসলমান, যাদের মোহাজের বলে অভিহিত করা হতো, তাদের পুনর্বাসনেও সরকার সফলতা অর্জন করতে পারেনি বরং বাঙালিদের সঙ্গে তাদের সংঘাত ও বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। এমন বিরূপ পরিস্থিতিতে ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ঢাকার নবাব খাজা নাজিমুদ্দিন পল্টন ময়দানে এক জনসভায় ঘোষণা করেন: 'পাকিস্তানকে আমরা এছলামী রাষ্ট্ররূপে গঠন করিতে যাইতেছি।... প্রাদেশিক ভাষা কি হইবে তাহা প্রদেশবাসীই ঠিক করিবেন, কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হইবে উর্দু।' (আহমদ, ২০১৫ [ভাষা]: ৩৫) এ বক্তব্য ১৯৪৮ সালের জিন্নার বক্তৃতারই প্রতিধ্বনি। কিন্তু খাজা নাজিমুদ্দিন প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন যে, বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব তিনি করবেন। অথচ প্রধানমন্ত্রী হয়ে নিজের কথারই বরখেলাপ করলেন। এর প্রতিক্রিয়া হলো ব্যাপক। ৩০ জানুয়ারি প্রদেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। প্রধান স্লোগান ছিল : 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। "৩১শে জানুয়ারি ঢাকা বার লাইব্রেরি হলে মাওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মী সম্মেলনে সরকারবিরোধী সব দল ও সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব

নিয়ে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। মূল উদ্দেশ্য পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠা করা। ৪০ সদস্যের ওই পরিষদের আহ্বায়ক মনোনীত হন কাজী গোলাম মাহবুব।' (আহমদ, ২০১৫ [ভাষা]: ৩৬) ৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ছাত্রসভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ২১শে ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী প্রতিবাদ কর্মসূচি পালনের। ওইদিন সমাবেশ শেষে ঢাকা শহরের রাজপথে মিছিলে ১০-১২ হাজার ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল। এ আন্দোলন আর কেবল ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। আন্দোলনের অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজনে ১১ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি পতাকা দিবস পালন করা হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারি ছিল পূর্ববঙ্গ আইনসভার প্রথম বাজেট অধিবেশন শুরুর দিন। ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্র-জনতার আন্দোলন, সরকারের ১৪৪ ধারা জারি, ছাত্রদের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা, পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়ার ঐতিহাসিক তথ্য এখন সর্বজনজ্ঞাত। তবে ২০ ফেব্রুয়ারি বিকালে ও রাতে পরবর্তী দিনের জন্য সরকার কর্তৃক জারিকৃত ১৪৪ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে সংগ্রাম পরিষদের কার্যনির্বাহী কমিটির যে সভা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে নেতৃবৃন্দের আপসকামী মনোভাব পরিষ্কার হয়ে যায়। ১৫ জন সদস্যের মধ্যে ১১ জনই ২১শে ফেব্রুয়ারির কর্মসূচি প্রত্যাহারের পক্ষে মত দেন। বাকি চারজন ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে মত দেন। (আনিসুজ্জামান, ২০১৫: ১৭৩) বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত নেতৃবৃন্দের সামনে ছিল আসন্ন প্রাদেশিক নির্বাচনের সমীকরণ। শেষ পর্যন্ত ২১শে ফেব্রুয়ারি সকালে ছাত্ররা পুরাতন কলাভবনের আমতলায় অনুষ্ঠিত সভায় ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষেই স্বতঃস্ফূর্ত রায় দেয়; এবং তা তারা কার্যকর করে। এ ঘটনা জনতার স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের কাছে নেতৃত্বের দোদুল্যমানতাকে নির্দেশ করে। আবুল কাসেম ফজলুল হক রাষ্ট্রভাষা-কেন্দ্রিক আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী পক্ষগুলোকে কয়েকটি বর্গে চিহ্নিত করেছেন:

> ১৯৫২ সনের ফেব্রুআরি আন্দোলনের যে নেতৃত্ব গড়ে উঠেছিল, 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ' ছিল যার সাংগঠনিক রূপ, তাতে ছিল প্রধানত তিন ধরনের উপাদান: এক. বুর্জোআ ভাবধারার আলোকে ইসলামি জীবনাদর্শের আধুনিকীকরণে বিশ্বাসী কমিউনিজম-বিরোধী তমুদ্দন মজলিস ও খিলাফতে রব্বানির কর্মীরা; দুই. বুর্জোআ আকাঙ্ক্ষা-তাড়িত উদারতাবাদী আপসকামী আদর্শগত প্রশ্নে দৃঢ়তাহীন আওয়ামী মুসলিম লীগ ও ছাত্র লীগের কর্মীরা; তিন. কমিউনিস্ট আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ সাংগঠনিক দিক দিয়ে নিতান্ত দুর্বল দোদুল্যচিত্ত যুবলীগ ও বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি। আন্দোলনকালে এই তিন ধরনের পরস্পর-বিরোধী উপাদান নিয়ে গঠিত নেতৃত্ব সমন্বিত, সুদৃঢ়, সুসংবদ্ধ ও সুসংহত হতে পারেনি। (১৯৯৮: ২৭)

অর্থাৎ নেতৃত্বের চেয়ে গণজোয়ারই ফেব্রুয়ারির আন্দোলনকে বেগবান করেছে। ঢাকায় ২১শে ফেব্রুয়ারিতেই এ আন্দোলন শেষ হয়ে যায়নি। ১৯৫২ সালের ২১, ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার ওপর গুলিবর্ষণ চলে। ওই গণহত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা এক প্রতিবাদ ও শোকসভা করেছিলেন ২৪ ফেব্রুয়ারি সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন ভবনে। ওই সভায় বক্তব্য দিয়েছিলেন

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মুজাফ্‌ফর আহমদ চৌধুরী (১৯২২-১৯৭৮), ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদ (১৯২৪-২০১২) এবং মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১)। ২৬ ফেব্রুয়ারি অধ্যাপক মুজাফ্‌ফর আহমদ চৌধুরী ও মুনীর চৌধুরীকে গ্রেফতার করা হয় এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক রাখা হয়। তাঁরা ১৯৫৪ সালে মার্চ মাসে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হবার আগ পর্যন্ত ছাড়া পাননি। (রফিকুল, ২০১৮: ১৫৩) এ আন্দোলন কেবল ঢাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি; পুরো বাংলাদেশে জেলা, মহকুমা ও থানা পর্যায়েও বিস্তৃতি লাভ করেছিল।

১৯৫২ সালের আন্দোলন ছিল একটি বৃহত্তর আন্দোলন। রাষ্ট্রভাষার প্রসঙ্গকে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর শোষণমূলক সামূহিক ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের একটি সফল উপলক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করা যায়। ভাষার সংকটকে স্বীকার করেও তৎকালীন অর্থাৎ পাকিস্তান সৃষ্টির পরবর্তী চার বছরে পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর বৈষম্য, দমননীতি, সাম্প্রদায়িকতা, দুর্নীতি, খাদ্যাভাব, দুর্ভিক্ষ, বিভিন্ন কৃষক আন্দোলন ইত্যাদি কারণের সম্মিলিত ফলাফল হিসেবে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের ব্যাপকতাকে চিহ্নিত করা যায়। বাংলার শোষিত জনতা তাদের শোষণমুক্তির জন্য যে আন্দোলন প্রজন্মান্তর ধরে করে আসছিল একুশের আন্দোলন তারই একটি দৃশ্যমান রূপ। আর তাই এ আন্দোলন ভাষাচেতনা, রাষ্ট্রভাষা প্রতিষ্ঠা বা মাতৃভাষা মর্যাদা রক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। এবং এ আন্দোলন শহর থেকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে মফস্বলে, গ্রামে, প্রান্তিক জনপদে। এর গভীরতা তৎকালেও যেমন ছিল বহুমাত্রিক এবং তেমনি পরবর্তীকালেও বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে এর গুরুত্ব বহুস্তরিক মাত্রা লাভ করে। চিন্তক আবুল কাসেম ফজলুল হকের মতে – 'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও পরবর্তী বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ-বিরোধী গণজাগরণ ও গণআন্দোলনই যেন সম্প্রসারিত হয়েছে।' (১৯৯৮: ২৩) উত্তরকালেও তাৎপর্যের এই পারম্পর্য ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে, যতদিন না শোষিত মানুষের শোষণমুক্তি ঘটবে। 'শুধু জাতিগত নিপীড়নই নয়, পূর্ব বাঙলার অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন শ্রেণী-শোষণ ও শ্রেণী-নিপীড়নও এই আন্দোলনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল।' (১৯৯৮ : ২৩) কিন্তু পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ও পরিবর্তিত রাষ্ট্রকাঠামোতে শোষকগোষ্ঠীর সেই অপরিবর্তিত শক্তিশ্রেণি একুশের আন্দোলনকে একমুখী তথা ভাষামুখী বা ভাষাসর্বস্ব করে তুলবার চেষ্টা করেছে। এ প্রবণতাকে কেবল অজ্ঞতা বা অসচেতনতা বলা যায় না। বরং নিপীড়িত মানুষের নিপীড়নবিরোধী গণআন্দোলনের শক্তিশালী চেতনা থেকে দূরত্ব সৃষ্টি করে একে মধ্যবিত্তের আবেগ ও আনুষ্ঠানিকতাকেন্দ্রিক বিষয়ে পর্যবসিত করবার পেছনে নতুন নতুন রূপে আবির্ভূত শোষকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যমূলকতাকে চিহ্নিত করা যায়।

২০০০ সাল থেকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' পালনের মাধ্যমে একুশের চেতনা রাষ্ট্রভাষা থেকে সরে গেছে মাতৃভাষার দিকে । কিন্তু তৎকালীন বাস্তবতা ও ইতিহাস সাক্ষ্য

দেয়, সেই আন্দোলন কোনো ক্রমেই মাতৃভাষা রক্ষার আন্দোলন ছিল না। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' ছিল প্রধান দাবি; মাতৃভাষা সংশ্লিষ্ট কোনো স্লোগান সেসময় উচ্চারিত হয়নি। পূর্বেই বলা হয়েছে – রাষ্ট্রভাষার সঙ্গে রাষ্ট্রের জনগণের জীবন-জীবিকার প্রশ্ন জড়িত। আর ১৯৪৭–১৯৫২ এ-কালপরিসরে ওই জীবন-জীবিকার প্রশ্নই রাষ্ট্রভাষার আধারে গতিশীল হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান কালে একুশের চেতনা রাষ্ট্রচেতনা থেকে সরে অনেকটা সংস্কৃতিমূলক হয়ে উঠেছে। সাংস্কৃতিক চেতনারও গুরুত্ব নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু নাম রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন হলেও, তা ভাষা ছাড়িয়ে যে সামূহিক শোষণবঞ্চনার বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে উঠেছিল, তা থেকে বর্তমান একুশের চেতনা অনেক দূরবর্তী। ১৯৭১ সালের পর বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে সরকারি কাজে বাংলার প্রবর্তন করা হলেও পরবর্তী সময়ে তাকে অক্ষু রাখা যায়নি। তাই বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষার মূল চেতনা থেকে দূরে থাকা হাল আমলের বাংলাভাষী অনেকেই মনে করে – এই আন্দোলন ছিল তথাকথিত 'শুদ্ধ উচ্চারণে' বাংলা বলার আন্দোলন। এমন প্রশ্নও শোনা যায়, বাংলা ভাষার আন্দোলনই যদি তা হয়ে থাকে, তবে এই দিবস '৮ই ফাল্গুন' না হয়ে '২১শে ফেব্রুয়ারি' হিসেবে কেন পালিত হয়? 'বাংলা শব্দ' 'স্মৃতিস্তম্ভ' না বলে কেন 'বিদেশি শব্দ' 'শহিদ মিনার' বলা হয়? এর একটিই জবাব – বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন তথাকথিত 'বাঙালিয়ানা' রক্ষার আন্দোলন ছিল না কখনোই। এসব ভাষাগত, শব্দগত, ধ্বনিগত বিচার তখন মুখ্য ছিল না। বরং বর্তমান আলোচনায় উপস্থাপিত তৎকালীন বাস্তবতার কার্যকারণ-সম্পর্কের মধ্যেই আছে বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য। বায়ান্নর রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন ও তার পরবর্তীকালে এ-নিয়ে অনেক শিল্প-সাহিত্যের জন্ম হয়েছে। একটি কবিতা আর একটি গানের কথা এখানে উল্লেখ করছি – কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ্ (১৯৩৪-২০০১) রচিত সুপরিচিত কবিতা 'মাগো ওরা বলে', আর আবদুল লতিফের (১৯২৭-২০০৫) গান 'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়'। গানটি তৎকালে এবং এখনও দারুণ জাগরণমূলক। কবিতার মধ্যে দেখা যায় ভাষা আন্দোলনে নিহত পুত্রের পকেটে থাকা রক্তাক্ত চিঠি। চিঠিতে পুত্র তার মাকে লিখছে – 'মাগো, ওরা বলে,/সবার কথা কেড়ে নেবে/তোমার কোলে শুয়ে/গল্প শুনতে দেবে না।' বুঝতে হবে এটা কবিতা। একুশে ফেব্রুয়ারি ও তারপর আরও কয়েকদিন পুলিশের গুলিতে অনেকে নিহত হয়েছিলেন। ফলে বিষয়টা গুরুতর। যদিও নিহতরা ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী কেউ ছিলেন না – তথ্য তা-ই বলে। কিন্তু এত বড় আন্দোলন ও রক্তপাত যখন হয়, তখন কবিতা ও গানে সামূহিক আবেগ থাকা স্বাভাবিক। এ আবেগের মূল্য আছে। কিন্তু মুখের ভাষা কেড়ে নেওয়া বা মায়ের কোলে মাথা রেখে গল্প শুনতে না দেওয়ার মতো কোনো বাস্তবতা তখন তৈরি হয়নি। কাব্য-সাহিত্য-গানের এসব বয়ানকে আক্ষরিক অর্থে ধরলে মূল চেতনা থেকে দূরত্ব বাড়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়। অবশ্য এর সঙ্গে জড়িত থাকে আরও বিভিন্ন তৎপরতা। সে-বিষয়টি ভালোভাবেই বোঝা যায় যখন 'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন'সৃষ্ট 'শহিদ দিবস' বিভিন্ন সময়পর্বে বিভিন্নমুখী

রূপান্তরের পরে 'মাতৃভাষা দিবসে' এসে ঠেকে। বহুস্তরিত, বিচিত্রমুখী ও বহুকৌণিক ঘটনাপুঞ্জ ও ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার একটি কার্যকর রূপ বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন। একুশের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ছিল গণমানুষের আন্দোলন, একুশের চেতনা প্রকৃত অর্থে গণমানুষেরই চেতনা। গণমানুষের মধ্যে যখন এই চেতনা কার্যকর হবে তখনই বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন পূর্ণ মাত্রায় সফলতা লাভ করবে।

টীকা

১. ইসলামি রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের খসড়া ম্যানিফেস্টোতে বলা হয়:

ক. পাকিস্তান খেলাফৎ বা আল্লাহর প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্র হবে;

খ. আল্লাহ-তালার ওপর এই রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা ও প্রভুত্ব ন্যস্ত থাকবে;

গ. আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসাবে জনগণ এই সার্বভৌম ক্ষমতা ও প্রভুত্বের অধিকারী হবে;

ঘ. পাকিস্তান ব্রিটিশ কমনওয়েলথ তথা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শাসনের বাইরে একটি পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসংঘ হবে। (উদ্ধৃত, সাঈদ-উর, ২০০১: ১৭)

২. আটদফা সম্বলিত চুক্তিনামাটি নিম্নরূপ:

১। ২৯শে ফেব্রুয়ারী (১৯৪৮) হইতে বাংলা ভাষার প্রশ্নে যাহাদিগকে গ্রেফতার করা হইয়াছে, তাহাদিগকে অবিলম্বে মুক্তিদান করা হইবে ।

২। পুলিশী অত্যাচারের অভিযোগ সম্বন্ধে উজীরে আলা [মুখ্যমন্ত্রী] স্বয়ং তদন্ত করিয়া এক মাসের মধ্যে এই বিষয়ে বিবৃতি দিবেন।

৩। ১৯৪৮ সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদে বেসরকারী আলোচনার জন্য নির্ধারিত তারিখে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার এবং ইহাকে পাকিস্তান গণপরিষদে এবং কেন্দ্রীয় চাকুরী পরীক্ষা দিতে Central services Examination উর্দুর সম-মর্যাদাদানের নিমিত্ত একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে।

৪। পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদে এপ্রিল মাসে একটি প্রস্তাব তোলা হইবে যে, প্রদেশের অফিস-আদালতের ভাষা ইংরেজীর স্থলে বাংলা হইবে ।

৫। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কাহারো বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না।

৬। সংবাদপত্রের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইবে।

৭। ২৯শে ফেব্রুয়ারী হইতে পূর্ববঙ্গের যে সকল অংশে ভাষা আন্দোলনের কারণে ১৪৪ ধারা জারি করা হইয়াছে, তাহা প্রত্যাহার করা হইবে।

৮। সংগ্রাম পরিষদের সহিত আলোচনার পর আমি এই ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হইয়াছি যে, এই আন্দোলন দুশমনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত নয়। (উদ্ধৃত, অলি, ২০১৫: ৪৯)

৩. জিন্নার প্রতি পাক-বাংলার মুসলমান বাঙালি ছাত্র-তরুণদের অনুরক্তি ও মুগ্ধতা এত বেশি ছিল যে, জেল-জুলুম, দমন-পীড়ন সত্ত্বেও আপস-চুক্তি সম্পাদনের পর রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি ১৮ই মার্চ (১৯৪৮) বৈঠকে বসে কায়েদে আজমকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করার উদ্দেশ্যে একটি ছাত্র-সংবর্ধনা কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। (বদরুদ্দীন, ২০১২ [১ম]: ১০১)

উল্লেখপঞ্জি

অলি আহাদ, ২০১৫। *জাতীয় রাজনীতি: ১৯৪৫ থেকে ৭৫*, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ঢাকা-চট্টগ্রাম।

আনিসুজ্জামান, ২০১৫ । *কাল নিরবধি*, তৃতীয় মুদ্রণ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

আবদুল হক, ১৯৭৬। *ভাষা আন্দোলনের* আদিপর্ব, মুক্তধারা, ঢাকা।

আবুল কাসেম ফজলুল হক, ১৯৯৮। *একুশে ফেব্রুআরি আন্দোলন*, জাগৃতী প্রকাশনী, ঢাকা।

আবুল মনসুর আহমদ, ১৩৪৯। 'সাহিত্যে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য', মোহাম্মদ আকরম খাঁ সম্পাদিত *মাসিক মোহাম্মদী*, ষোড়শ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, কলকাতা।

আবুল মনসুর আহমদ, ১৯৪৭। 'বাংলাই আমাদের রাষ্ট্র-ভাষা হইবে', *পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষা বাংলা– না উর্দু?*, প্রকাশক : অধ্যাপক এম. এ. কাসেম, প্রথম সংস্করণ, তমদ্দুন মজলিস প্রচার বিভাগ, ঢাকা।

আবুল মনসুর আহমদ, ২০১৬। *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, পুনর্মুদ্রণ, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা।

আহমদ রফিক, ২০১৫। *দেশবিভাগ: ফিরে দেখা*, তৃতীয় মুদ্রণ, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা।

আহমদ রফিক, ২০১৫। *ভাষা আন্দোলন*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

আহমদ শরীফ, ২০১১। *বাঙলাভাষা-সংস্কার আন্দোলন*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

তাজউদ্দীন আহমদ, ২০২২। *তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরি ১৯৪৭-৪৮ (প্রথম খণ্ড)*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

বদরুদ্দীন উমর, ২০১২। *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (প্রথম খণ্ড)*, সুবর্ণ, ঢাকা।

বদরুদ্দীন উমর, ২০১২। *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (দ্বিতীয় খণ্ড)*, সুবর্ণ, ঢাকা ।

রফিকুল ইসলাম, ২০১৮। 'বাংলা বিভাগের প্রতিবাদী ভূমিকা', *শতবর্ষের পথে বাংলা বিভাগ*, প্রকাশক: সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা অ্যালামনাই, ঢাকা।

শেখ মুজিবুর রহমান, ২০১৪ । *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, চতুর্থ মুদ্রণ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

সাঈদ-উর রহমান, ২০০১। *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা,* দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা।

হুমায়ুন আজাদ, ২০১৪ । *ভাষা-আন্দোলন: সাহিত্যিক পটভূমি,* তৃতীয় মুদ্রণ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা ।